হৃদয়ের আলো

পীযূষ ঘোষ

জুন, ২০১০

“মা আসছি”

“হ্যাঁ এসো, ভালো করে বোনের হাতটা ধরে রাস্তাটা পার করে দিবি, আর শোন্, বোনের প্রথম ক্লাস পরিক্ষাটা কেমন হয়েছে একটু ঊষা দিদিমনির কাছে জেনে আসবি টিফিনের সময়”

“ঠিক আছে, অ্যাই বোন চল্না দেরি হচ্ছে তো !” বোলে ব্যগটা পিঠে ফেলে ইস্কুলে বেরোলো মিতু। খানিকটা মাটির রাস্তা ধরে গিয়ে তারপর ছ-ফুটেরও কম চওড়া বাসের সড়কের ওপারে ইস্কুল, একই গ্রামে। সড়কটি সেরকম চওড়া না হোলেও মায়ের মনতো, রোজ ইস্কুলে যাবার সময় মিতুকে বোনের ব্যপারে একবার সাবধান করে দেয়। আর তাছাড়া তার ছোট মেয়ে সিমিকে তো সে খুব ভালোভাবে চেনে তাই দিদির ওপর এই বাড়তি দায়িত্ব্যটা দেওয়া। বাড়ির থেকে ইস্কুল পৌঁছাতে খুব বেশি হোলে মিনিট পনেরো লাগে, কিন্তু সিমির দৌরাত্ব্যে ওই পনেরো মিনিট মিতুর কাছে পাঁচ ঘন্টা মনে হয়। কখনো সে একটা পাথরের টুক্রোকে ইস্কুল থেকে পায়ে করে ঠেলতে ঠেলতে বাড়ির অতিথি করে নিয়ে আসে, কখনো বা পাশা পাশি বন্ধুদের বাহাদুরি দেখানোর জন্য এক পায়ে লাফাতে লাফাতে আর্ধেকটা পথ অতিক্রম করে ফেলে, আবার কখনো বা দিদির হাত ধরে ঝুলেই পড়ে। আর এসবই মিতুকে সামলাতে হয়। মাঝে মাঝে দিদি সুলভ ভাবটা প্রকাশের যে একটা ইচ্ছা বা লোভ হয়না তা নয়, তবে কখনই সে কিছু বলেনা আর সেই জন্যেই দিদি তার খুব প্রিয়। বয়েসে সিমির থেকে বছর চারেকের বড় হলেও ব্যবহার, ধৈর্য, বোধশক্তি এসবের দিক থেকে মিতু যেনো আরো অনেক বছরের বড়। সপ্তাহ দুই আগে পরিক্ষার ফল বেরোয়, বাগ্দেবী তাদের প্রচেষ্টায় প্রসন্ন থাকায় দুজনেই নতুন নতুন ক্লাসে পা রেখেছে। মিতু ক্লাস সিক্সে আর সিমি ক্লাস টু-তে। নতুন ক্লাস বলে ইস্কুলে যাওয়ার উৎসাহটা স্বভাবতই একটু বেশি।

মিতু লেখাপড়ায় একেবারে প্রথমের দিকের না হোলেও অন্যান্য ব্যপারে তার উৎসাহ চোখে পড়ার মত। আবৃত্তিতে তার কোনো মাষ্টার নেই বা কোনো প্রশিক্ষণ শিবিরে নামও লেখায়নি, তবু সে আবৃত্তিটা ভালই রপ্ত করেছে। গত বছর রবীন্দ্রজয়ন্তিতে একটা নাটক করেছিলো মিতু। তার অভিনয় এখনো মাষ্টারমশাইদের মুখে মুখে ঘোরে। এসব সূত্রে ইস্কুলে অনেক বন্ধু তার। অনেকেই মিতুর সঙ্গে বন্ধুত্ব্য পাতাতে আসে আর মিতু কোনো রকম কার্পণ্যতা না করে বাড়িয়ে দেয় হাত। নতুন ক্লাসে উঠে বেশ কয়েকটি নতুন বন্ধু হয়েছে, বেশির ভাগ ছাত্র ছাত্রির নাম সে জানে। একদিন সে খেয়াল করলো ক্লাসের একেবারে পেছোনের বেঞ্চের ডান দিকের বসা মেয়েটার সঙ্গে তার পরিচয়-ই হয়নি, বন্ধুত্ব তো

দুরন্ত। একদিন মনে মনে ঠিক করলো টিফিনে কথা বলবে তার সঙ্গে। খেলার মাঠে অনেক্ষন অপেক্ষাও করলো কিন্তু তাকে দেখতে পেলোনা। ছুটির ঘন্টার পর ক্লাসের বাইরে এসে তাকে পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো "তোর নাম কি, কোথায় থাকিস তুই ?" অতর্কিতে পেছন থেকে প্রশ্নটি আসায় একটু ঘাবড়ে যাই মেয়েটি। আর তাছাড়া প্রশ্ন গুলি যে তারি উদ্দেশ্যে উচ্চারীত তাও বুঝে উঠতে সময় নেয় মেয়েটি। কিছুটা মুশকিলেই পড়ল সে বলা যেতে পারে। তবে তখনের মত সিমি তার মুশকিলাশান করে।

"দিদি চল্না, দিদি..." বলে টানতে টানতে সে মিতুকে নিয়ে যায়। উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে যেতে হয় মিতুকে। ভাষায় না হলেও মনে মনে সিমির প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মেয়েটি।

পরের দিন ইস্কুলে এসে আর ছুটির ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয় মিতু। তাই মিতু ঠিক করলো একদিন সে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে খেলা বিসর্জন দিয়ে নতুন বন্ধুত্বকেই গুরুত্ব দেবে। যথারীতি টিফিনের ঘন্টা পড়ার শব্দে সবাই হৈ চৈ করতে করতে বেরোতে থাকে, শুধু শেষের বেঞ্চে একটি মেয়ে যেনো ব্যস্ত নিজের সঙ্গেই। বাইরের রৌদ্রজ্জ্বল আকাশ যেনো সকল প্রচেষ্টাতেও ব্যর্থ তার মনকে ছূঁতে। মিতুও এমন একটা ভাব দেখালো যেনো ক্লাসের চার দেয়ালের মাঝেই সমস্ত প্রশান্তি। হাত পা ছড়িয়ে বসে রইল নিজের জায়গায়। সবাই বেরিয়ে গেলে মিতু তার পরিচিত হাসিটি মুখে তুলে এগিয়ে গেলো মেয়েটির দিকে। মিতু কাছাকাছি আসতেই মেয়েটি হঠাৎ-ই তার ব্যস্ততা ভেঙ্গে, উঠে দাঁড়িয়ে, বেঞ্চের উলটো দিক্টা দিয়ে বেরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

"শোন! তোর নামটা বললিনা তো কাল" মিতু বললো।

মিতুর দিকে না তাকিয়েই " জল খেতে যাচ্ছি" বলেই ক্লাসের চৌকাঠ ছাড়লো মেয়েটি, সুযোগও দিলোনা মিতুকে পরের প্রশ্নের। অনেকক্ষন অপেক্ষা করলো মিতু ক্লাসে বসেই কিন্তু মেয়েটার জল খাওয়া আর শেষ হলো না। টিফিনের পর বাকি তিনটে পিরিয়ডে মিতু অনেকবার চেষ্টা করলো মেয়েটির চোখে চোখ রাখতে, দৃষ্টির মধ্যেই যেনো বুঝিয়ে দিতে চাইলো বন্ধ্যুত্বের পূর্বেই বন্ধুর এমন আচরণ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু যে দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য তার এই চেষ্টা তার দেখা মিললো না। মনের মধ্যে একটা তৎসামান্য রাগ জন্মালেও তাকে বাড়তে দেওয়ার মেয়ে মিতু নয়। ক্লাসের ব্ল্যাক-বোর্ড থেকে মন সরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো বন্ধ্যুত্বের আনাচে কানাচে।

দিনের শেষ পিরিওড্টা খেলার ক্লাস। রমা দিদিমণি এই সময় সবাইকে নিয়ে যায় খেলার মাঠে। খেলার মাঠটি মৌশানি গ্রামের এই ইস্কুলটির একটা বড় অলঙ্কার। মাঠটির তিনটি দিকে আম আর শেগুনের ছায়া, আর দক্ষিন দিকটা হারুদার ফুলের বাগান। সময়ে সময়ে ক্লাসের ঘন্টা বাজানোর ফাঁকে ফাঁকে হারুদা তার দল নিয়ে বাগানটার দেখাশোনা করে আর সূযোগ পেলেই ছেলে মেয়েদের মজার মজার গল্প আর ঠাট্টা তামাসায় মাতিয়ে তোলে। ইস্কুলের এই অলঙ্কার কবে কবে যে অহঙ্কারে পরিনত হয়েছে তা ছেলে মেয়েরা নিজেরাও টের পাইনি। কিছু ক্ষন খেলাধূলো, ছুটোছুটির পর হাঁপিয়ে ওঠে

মিতু। আম আর শেগুনের তলায় ছোটো বড় দলে ভাগ হয়ে সবাই খেলায় ব্যস্ত। একটু ভেতরের দিকে একটা বকুল গাছের তলায় বসে একটি মেয়ে। পাশাপাশি আর কাউকে চোখে পড়ে না। পা দুটি সামনের দিকে কিছুটা মেলে, হাঁটুর ওপর চিবুক্‌টা রেখে, হাতের ছোটো পাথরগুলি দিয়ে এক হাত দূরে পড়ে থাকা অসহায় পাথরগুলিকে মারার চেষ্টা করে চলেছে। এই তার খেলা, এর মধ্যেই তার সমস্ত আনন্দ, সমস্ত তৃপ্তি। ওই পাথরগুলোর কোনো নাম নেই, এদের চেনেও না সে, আর দেখাও পাবেনা হয়ত এদের কোনোদিন, তবু এরাই তার কত আপন, কত কাছের।

“কিরে এখানে একা একা বসে ?”

পেছন থেকে একটা কোমল স্পর্শ ডান কাঁধের ওপর। ঠিক এরকমি একটা গলা পেছন থেকে গতকাল ভেঁসে এসেছিলো ছুটির ঘন্টার পর।

“আমার নাম মিতালি, সবাই ডাকে মিতু বলে, আজ থেকে আমরা বন্ধু। কিন্তু, তোর নামটা বললি না তো!” বলে হাতটি বাড়িয়ে দেয় মিতু।

মিতালির বাড়ানো হাতকে অবজ্ঞা করে উঠে চলে যায় তাতে মন ঠিক সায় দেয়না, আবার ঠিক যেনো সাহসও হয়না মন খুলে সেই ডাকে সাড়া দিতে। হাঁটুর থেকে মুখটা সরিয়ে তাকালো মিতুর দিকে। মিতু ততক্ষনে একেবারে তার সামনে। এত কাছ থেকে মেয়েটিকে প্রথম দেখছে মিতু। দৃষ্টির মধ্যে এক অদ্ভুত বিহ্বলতা, আবার তার পেছনেই ভেঁসে বেড়াচ্ছে না বলা কথার বেশ কিছু কালো মেঘ। হাসিতে একটা দারুন মাধুরী, অথচ গোটা মুখ জুড়ে একটা সংজ্ঞাহীন ভয়ের প্রলেপ।

“আমি শ্রাবনি, বোস্‌ এখানে। কোথায় থাকিস্‌ তুই?”

স্বরের মধ্যে একটা প্রশান্তির ছোঁয়া, আবার তারি মাঝে কোথায় যেন একটা চাপা আর্তনাদের কম্পন। একটা বারো বছরের মেয়ের মুখ যে বাস্তব জীবনের এতগুলো ছবিকে এক সঙ্গে স্থান দিতে পারে তা শ্রাবনিকে না দেখলে বিশ্বাসি করা যায় না।

“আমার বাড়ি মৌশানিতেই, কিন্তু তোকে তো আগে এখানে দেখিনি !”

“আমার বাড়ি, না মানে আমি থাকি দামাজোড়াই, এ বছরি এই ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি।”

এরকম একটা দুটো কথা বলতে বলতে কখন যে দুটি কোমলপ্রানা শিশু সবার আড়ালে বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণকে সাক্ষি রেখে একে অপরকে মনের মাঝে স্থান দিয়ে ফেলেছে তা নিজেরাও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

দামাজোড়া গ্রামটা মৌশানি ইস্কুল থেকে প্রায় মাইল দেড়েকের পথ, রাস্তার থেকে ভেতরের দিকে। ছোট্ট গ্রাম, ধান আর আলুই প্রধান ফসল। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তাও আবার বৃষ্টি বাদলে

যথার্থ ছাউনির অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। হেঁটেই আসে শ্রাবনি সেখান থেকে, অবশ্য ভাগ্য ভালো থাকলে কখনও কখনও কোনো সহৃয় ব্যক্তির সাইকেলের পেছনে তার জায়গা হয়ে যায়। এক একদিন শেষ পিরিওডে অঙ্কের ক্লাসটা আর ক্ষিদে এই দুই মিলে তার বাড়ি ফেরার দেড় মাইল পথটা কয়েক গুন বাড়িয়ে তোলে। দামাজোড়া আসলে তার নিজের গ্রাম নয়, মামাবাড়ি।

"তাহলে তোর মা-বাবা কোথায় থাকে, তোর বাড়ি কোথায়?"

প্রশ্নটা করে ফেলেই মিতু দেখলো শ্রাবনির গোটা মুখটা কেমন গুমোট হয়ে গেলো, চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করছে। মিতু বুঝলো এক দূর্বল হৃদয়ের দূর্বলতম স্থানে সে স্পর্শ করে ফেলেছে। স্পর্শ বললে কম বলা হয়, আঘাত করে ফেলেছে বলা যায়। বৃষ্টি আসার আগেই শ্রাবনির দুটো কাঁধ শক্ত করে দুহাত দিয়ে ধরলো মিতু আর তাতেই কিছুটা শক্তির সন্ধান পেয়ে নিজেকে সামলে নেয় শ্রাবনি।

শ্রাবনির আসল গ্রাম চাঁদসা, একই জেলা শহরের অন্য প্রান্তে। রাস্তার মোড়ে একটা চা দোকান ছিলো বাবার, সঙ্গে মিষ্টি নিম্‌কি নিয়ে বেশ চলতো দোকানটা। দিনরাত খাটতো তার বাবা সেই দোকানটার পেছোনে। বিশেষ করে ছোট্ট মেয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিভার সন্ধান পাবার পর তার পরিশ্রমের মাত্রাটা যেন আরো বেড়ে যায়। বেশ চলে সংসার। কিন্ত বিধাতার গল্পটা বোধহয় লেখা ভিন্ন ভাবে। প্রায় বছর দুয়েক আগে, গ্রীষ্মের এক প্রখর দূপুরে, নিজের দোকানের ভেতরেই একটি স্থানিয় রাজনৈতীক দাঙ্গার ভূল নিশানা হয়ে চিরকালের মত থেমে যায় সরল পরিশ্রমি মানুষটি।

তারপর সেই চা দোকানটিকেই সম্বল করে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিলো তার মা, চেয়ে ছিলো মেয়ের চোখে দেখা বাবার স্বপ্নগুলো পুরন করতে। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাব, পাশাপাশি দোকানের প্রতিদ্বন্দিতা, সমাজের জটিল সংস্কার, সৃষ্টি ছাড়া আচার, সবে মিলে বাধ সাজলো। ব্যবসা চলেনা, চলেনা ঠিকভাবে সংসারও। ছ মাসের মধ্যেই পৌষ পার্বনের এক সন্ধ্যায়, মেয়ের জন্য পিঠে গড়তে গড়তে উনুনের ধারেই শেষ বারের মত নিশ্বাস নেয় তার মা। তার পর যত্ন করে কাকা জ্যাঠারা তাকে পাঠিয়ে দেয় মামার বাড়িতে। আর সেই থেকেই শ্রাবনি থাকে মামা-মামির কাছে। থাকে বললে ভূল বলা হবে, দিন কাটায় বলা যেতে পারে। মামিমার ব্যবহার তার থাকাটাকে দিন কাটানোতে রুপান্তরীত করেছে। একটি মানুষের অসহয়তার সম্পূর্ন সদ্‌ব্যবহার করার নানা রকম কৌশলে পারদর্শি তার মামিমা। আর তার এই কৌশলের চাপে পড়ে মামার ভালবাসার ও সহানুভূতির বন্ধনও এই অল্প সময়ে বেশ খানিকটা শিথিল হয়ে গেছে। গুরুজন, আপনজন, বলে এই সব মেনে নিয়ে এগিয়ে চলার মত বোধশক্তি শ্রাবনির আছে। কিন্তু তার থেকে বছর দুয়েকের বড় তার মামাতো দিদির ব্যবহার তার জীবনকে করে তুলেছে দূর্বিসহ। দিদি-বোনের সম্পর্কটাকে অনায়াসে করে তুলেছে মালকিন-চাকরের সম্পর্কে।

"জানিস্‌ মিতু, একদিন..." কিছু একটা বলতে গেল কিন্তু ছুটির ঘন্টা বেজে উঠল, বলা হোলো না। বাকিরা যখন মাতাল হয়ে ছুটছে ঘরের দিকে, একটি শিশুর পা যেন মন্থর হয়ে আসে এই ছুটির ঘন্টার শব্দে।

মিতুর ইচ্ছে ছিলো শ্রাবনিকে দু-পা এগিয়ে দিয়ে আসে, কিন্তু ওদিকে আবার সিমি কোথায় কার ঘাড়ে উঠে লাফালাফি শুরু করবে, সে কথা ভেবে আর সাহস হোলো না।

"আচ্ছা দিভ্ভাই, বল্ দেখি, তেতুল পাতা কেনো এত ছোটো অথচ কলা পাতা এত বড়?" বাঁ হাতটাতে দিদির হাত ধরে, ডান হাতে একটা বল নাচাতে নাচাতে প্রশ্ন করে সিমি। কিন্তু উত্তর পাইনা সে। হয়তো এতক্ষনে শ্রাবনি ওই বড় অশত্থ গাছটা পেরিয়ে গেছে, ভাবছে মিতু।

"কিরে দিভ্ভাই, বল্না কলাপাতা কেনো এত বড়ো !"

কোন পাতা কেন ছোটো তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না মিতুর। তার কানের সামনে তখনও শ্রাবনির সেই করুন কথাগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে আর চোখের সামনে শ্রাবনির সেই না বলা কথার দৃষ্টি। তার মন ব্যকুল হয়ে ওঠে, যদি পারতো সে শ্রাবনির ওই গলার স্বর আর দৃষ্টির সংজ্ঞাটাকে পালটে দিতে। কেন-ই বা ওর মামিমা এরম করে, তবে কি মা বাবা নেই বলে। এরকম নানান্ সাত পাঁচ কথা ভাবতে থাকে মিতু। কোনো রকমে হুঁ, না তে সিমির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাড়ি পৌঁছায়।

রাত্রে বেলায় খেতে বসে মিতুকে মা জিজ্ঞাসা করে "কিরে তোর শরীর খারাপ নাকি, এত চুপ চাপ কেন !"

"কই না তো, জানো মা আজ আমার একটা নতুন বন্ধু হয়েছে ইস্কুলে"

এর পর প্রায় সপ্তাহখানেক কেটে যায়। মিতু আর শ্রাবনিকে প্রায় সময় এক সঙ্গে দেখা যায়। টিফিনের সময় মিতু আর একা বসে থাকতে দেয়না শ্রাবনিকে, খেলার পিরিয়ডেও এক সঙ্গে খেলে ওরা। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের এই গড়ে ওঠা বন্ধনটা অনেকের কাছেই ঈর্ষনীয় হয়ে উঠল। ব্যাগে লুকিয়ে এনে শ্রাবনি তার নিজের ড্রয়িং ও অন্যান্য হাতের কাছ দেখায় মিতুকে। একদিন সেই খেলার মাঠের বকুল তলায় বসে শ্রাবনি একটি গান শোনায়। শ্রাবনি যেন বুঝেছে যে তার গুনের কদর করার মত মন এই জগতে এক মিতুর-ই আছে। এদিকে মিতু শ্রাবনিকে যতই দেখে ততই অবাক হয়, ততই যেন শ্রাবনির পাশে এসে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা দৃঢ হয়। গান শেষ হবার পর কথা বলতে বলতে মিতু হঠাৎ দেখে শ্রাবনির ডান পায়ের গোড়ালির কিছুটা ওপরে একটা লম্বা কালশিটে দাগ। দাগটার বয়স যে খুব পুরানো নয় তা মিতুর মত ছোট মেয়েও বুঝতে পারে। নানা ভাবে চেষ্টা করে কারনটা জানতে পারে মিতু। দু-সেকেন্ডের জন্য স্থির হয়ে সেই নৃশংস হৃদয়টার একটা চিত্র মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করে সে। তার পর কিছুক্ষন কথাবার্তা হয় দুজনের মধ্যে, যেখানে বেশীর ভাগ সময়টাই শ্রাবনি ছিল শ্রোতা।

সেদিন বাড়ি ফেরার দৃশ্যটা ছিলো অন্য দিনের থেকে একটু আলাদা। মিতুর ডানদিকে অস্থির সিমি তার আপন জগতের ব্যস্ততাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে, আর বাঁদিকে থম্ থমে একটা মুখ, সংকোচ, প্রশ্ন, প্রত্যাশা আর ভয়ের একটা পোট্লা কে মাথায় নিয়ে পা মিলিয়ে চলেছে।

“অ্যই বোন শোন, আজ থেকে শ্রাবনি আমাদের বাড়িতেই থাকবে, তোর আরেকটা দিদি, বুঝলি !” বলেই শ্রাবনির দিকে তাকালো মিতু।

“কি মজা, কি মজা !” ডান পাটা সামনের দিকে সোজা করে তুলে বাঁ পাটা দিয়ে দুয়েকবার নেচে নিলো সিমি। কিন্তু বলার পরে তার মনে পড়ল, যদি এই দিদিটা তার ঠাকুমার পাশে শোবার জায়গাটা দখল করে নেয়; তার দুধের সর থেকে যদি এই দিদিটাকে ভাগ দিতে হয়; খেলাপাতির বাক্সে তো মাত্র দুটো হাঁড়ি, তাহলে কি ওরটাই চেয়ে বসবে এই দিদিটা। এই সব নানা কথা ভেবে মুহূর্তের মধ্যে স্বর বদলালো সিমি।

“দিভ্ভাই, ও কেনো আমাদের বাড়িতে থাকবে, ওর নিজের বাড়ি কেনো যাবেনা !”

“সিমি, এই দিদিটা খুব ভালো দেখিস্”।

শ্রাবনি সেই মাঝে আদর করে সিমির চুলগুলো ঘেঁটে দিলো। যেন মিতুর কথাগুলোর একটা ছোট্ট নমুনা রাখলো সিমির কাছে। শ্রাবনির মনে নানা প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মেরে গেলো। কেন যাচ্ছে ও মিতুর বাড়ি, মিতুর বাড়ির সবাই তো ওর মতো ভালো হবে তার কোনো মানে নেই, যদি মিতুর মা বাবা খুব রাগি হয়, যদি মিতুকে বকাবকি করে, এই সব আরো কত কি। এদিকে মিতু কিন্তু আজ আর সিমিকে নিয়ে ব্যস্ত নয়। তার ব্যস্ততা একরাশ ভাবনাকে ঘিরে। কি ভাবে বলবে সে কথাটা বাড়িতে। বাবার ওইতো দু-চিলতে জমির ওপর সংসার চালানো, দাদু নিশ্চয় রেগে যাবে এই সব দেখে, মা যদি পছন্দ না করে তাহলে তো সে শ্রাবনির কাছে মুখই দেখাতে পারবে না। বাড়ির যতই কাছাকাছি আসে ততই মন্থর হয়ে পড়ে পায়ের গতি। তারপর বাড়ির কাছে আসতেই সিমি দিদির হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে মা, দাদু, ঠাকুমাকে খবরটা দেয়।

মা এসে দাঁড়ায় উঠোনে, পেছোনে ঠাকুমাও। ওদিকে ভয়ে চিন্তায় থমথমে দুটি মুখ এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে, যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধটি করে তারা নিজেদের আত্মসমর্পন করতে চলেছে। এরমধ্যে মিতুর বাবাও এসে দাঁড়ায়। মিতু কি ভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না, শ্রাবনির দৃষ্টি নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে। দাদুকেও সিমি টানতে টানতে এনে হাজির করে। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বলার পর তাদের বাড়িতে শ্রাবনির থাকার ব্যপারটা পাড়লো মিতু। সবাই একবার তাকাই শ্রাবনির সরল, নিষ্পাপ মুখটির দিকে।

মিতুর বাবা কেমন যেনো একটু রেগে গিয়ে বললো “ না, না তা কি করে হয়। মিতু তুই তো কাল আমাদের কিছুই বলিস নি! মানে এটাতো আমি কিছুই জানতাম না” বলে দুরের নারকেল গাছটার দিকে তাকিয়ে রইলো। মুখে রাগের কথা থাকলেও নারকেল গাছটির দিকে তার দৃষ্টি তার মনের অন্য কথা বলে। মেয়ের এই ব্যবহারে সে গর্বিত, যেন অন্য মিতুকে দেখলো সে।

দাদু বললো "এতো আইনি ব্যপার হয়ে যাবে, পুলিশ টুলিশ এলে আমরা কি উত্তর দেব ?" বলে দাদু মিতুর দিকে তাকিয়ে থাকলো। মিতু আরো ঘাবড়ে যায়, ভাবে দাদুর প্রশ্নের কি উত্তর দেবে। ছোট্ট মিতুর পক্ষে আন্দাজ করাও কঠীন যে দাদুর সেই স্বরের মধ্যে কতটা প্রশংসা আর আশীর্বাদ মেশানো তার জন্য।

"ঠাম্মা আমি কিন্তু তোমার পাশেই শোবো" বলে সিমি তার ঠাকুমার পিঠে দোল খেতে শুরু করে।

সেই মুহুর্তে শ্রাবনির মধ্যে কিরকম একটা মিতুর ওপর অভিমানের ঢেউ খেলে গেলো। আর মিতুর সারা মুখ জুড়ে অপরাধবোধ আর লজ্জার ছাপ সূস্পষ্ট হয়ে উঠল। দুজনেরই দৃষ্টি মাটির দিকে।

এর ফাঁকে পাড়ার রতন মাষ্টার কখন এসে দাঁড়িয়েছে একপাশে। সমস্ত ব্যপারটা শুনে দেখে তার মনে হোলো এই ছোট্ট মিতুর মত আমরা বড়রা যদি ভাবতে পারতাম তাহলে শ্রাবনির মতো হাজার হাজার অসহায়দের হয়তো বুকে ব্যথা আর চোখে জলকে সঙ্গি করে বাঁচতে হোতো না। শুধু মনে মনে বাহ্‌বাই দিলোনা, মিতু যে তার ছাত্রি এটা ভেবে একটা তৃপ্তির শিহরণ খেলে গেলো তার গোটা মন জুড়ে।

মিতুর মায়ের মুখে কোনো কথা নেই, সব শুনে সে শুধু দুটি হাত বাড়িয়ে দিলো শ্রাবনির দিকে, মিতু মুখ তুললো, শ্রাবনিও মুখ তুলে তাকালো মিতুর মায়ের দিকে। কিছু বলার আগেই মিতুর মা তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিলো। বাঁদিকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো সিমি তার পর ডানদিকে মিতু।

বাবা বললো "চলো ঘরে চলো"